بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ২০ ফাতহ্, ১৪০৩ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিভিন্ন সারিয়্যা ও যুদ্ধের ঘটনার আলোকে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসে **উকাশা বিন মিহসানের সারিয়্যা**রও উল্লেখ পাওয়া যায়। **উকাশা বিন মিহসানের** এই অভিযান **গামার মারযূকের** দিকে হয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই অভিযান পরিচালিত হয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, মহানবী (সা.) তাঁর একজন মুহাজির সাহাবী উকাশা বিন মিহসান (রা.)-র নেতৃত্বে চল্লিশজন মুসলমানের একটি দল বনু আসাদ গোত্রের মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। এই গোত্রটি তখন মদীনা থেকে মক্কাভিমুখে কয়েক দিনের দূরত্বে অবস্থিত **গামার** নামক একটি কূপের ঝরনার কাছে শিবির স্থাপন করছিল। তাদের দুষ্কৃতি রুখে দেবার জন্য উকাশা (রা.)-র দলটি দ্রুতগতিতে সফর করে গামারে পৌঁছে, যেন তাদের কৃত ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা যায়। জানা যায়, (বনু আসাদ) গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে দিগ্‌বিদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তখন উকাশা (রা.) ও তার সঙ্গীরা মদীনায় ফেরত চলে আসেন আর (সেখানে) কোনো লড়াই হয় নি।

একইভাবে **মুহাম্মদ বিন মাসলামার সারিয়্যারও** উল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানী মাসে এই অভিযান পরিচালিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে **বনু সালাবা ও বনু আউয়াল** গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যারা **যুল কাস্‌সায়** বসবাস করতো। আর **যুল কাস্‌সা** মদীনা থেকে **রাবাযা**-র পথে ২৪ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র সাথে দশজনকে প্রেরণ করেছিলেন। এই দলটি রাতের বেলায় সেখানে পৌঁছে। তারা হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ও তার সঙ্গীদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘিরে ফেলে এবং শত্রুরা সংখ্যায় একশজন ছিল। শত্রুরা তির দিয়ে মুসলমানদেরকে ঘিরে না ফেলা পর্যন্ত তারা (এটি) বুঝতেই পারেন নি। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ত্বরিৎ জেগে ওঠেন আর তার কাছে ধনুক ছিল। তিনি তার সঙ্গীদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলেন, (নিজেদের) অস্ত্র হাতে তুলে নাও। তারা সবাই চটজলদি উঠে যান। রাতের এক প্রহর (উভয় পক্ষের মধ্যে) তির বিনিময় চলতে থাকে। (কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের মাঝে তির নিক্ষেপ চলতে থাকে।) এরপর বেদুইনরা বল্লম দিয়ে আক্রমণ করে বাকি যারা জীবিত ছিলেন তাদের সবাইকে শহীদ করে দেয় আর মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) আহত হয়ে (মাটিতে) লুটিয়ে পড়েন। তার গোড়ালিতে এমন আঘাত লেগেছিল যার ফলে তিনি নড়াচড়া করতে পারছিলেন না। আর শত্রুরা তার গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে চলে যায়। একজন মুসলমান শহীদদের পাশ দিয়ে যাবার সময় (শহীদদের দেখে) إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পাঠ করেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার শব্দ শুনে নড়ে ওঠেন। তিনি (তথা সেই সাহাবী) তাকে খাবার দেন এবং নিজের বাহনে করে তাকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র সঙ্গীদের শাহাদাতের জন্য দায়ী শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও একটি অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই অভিযানকে **হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্‌'র সারিয়্যা** বলে। এর বিশদ বিবরণে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন, অর্থাৎ যুল কাস্‌সায় মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র সঙ্গীদের শাহাদাতের সংবাদ জানতে পারেন, তখন তিনি (সা.) আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্‌ (রা.)-কে, যিনি একজন কুরাইশ এবং জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হতেন, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য **যুল কাস্‌সা** অভিমুখে প্রেরণ করেন। আর যেহেতু ইতঃমধ্যে এই সংবাদও এসে গিয়েছিল যে, বনু সালাবা গোত্রের লোকেরা মদীনার উপকণ্ঠে আক্রমণ করার দুরভিসন্ধি রাখে– তাই মহানবী (সা.) আবু উবায়াদা (রা.)-র নেতৃত্বে চল্লিশজন চৌকস সাহাবীর (একটি) দল প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, রাতভর সফর করে তারা যেন প্রত্যুষে সেখানে পৌঁছে যান। আবু উবায়দা (রা.) নির্দেশ পালন করে ঠিক ফজরের নামাযের সময় গিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করেন। আর তারা এই অতর্কিত আক্রমণে বিচলিত হয়ে যৎসামান্য প্রতিরোধের পর পলায়ন করে নিকটবর্তী পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবু উবায়দা (রা.) গনিমতের সম্পদ করায়ত্ত করে মদীনা অভিমুখে ফিরে আসেন।

এই অভিযানে যে দুইজন সাহাবীর উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্‌ (রা.)– তারা উভয়ে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার ব্যক্তিগত গুণাবলি এবং যোগ্যতা ছাড়াও ইহুদী (নেতা) কা'ব বিন আশরাফ হত্যার হিরো বা নায়ক ছিলেন, কেননা তার হাতেই এই নৈরাজ্যবাদির ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) আনসারের অওস গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে তাকে তাঁর বিশেষ আস্থাভাজন জ্ঞান করা হতো। আর এ কারণে উমর (রা.) সাধারণত তাকেই নিজের গভর্নরদের বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তের জন্য প্রেরণ করতেন। হযরত উসমান (রা.)-র মৃত্যুর পর মুসলমানদের মাঝে যখন অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যের দ্বার উন্মোচিত হয় তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) নিজের তরবারিকে একটি পাথরে আঘাত করে ভেঙে ফেলে নিজের হাতে একটি লাঠি তুলে নেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (উত্তরে) বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে আমি একথাই শুনেছি, **'মুসলমানদের মাঝে যখন পারস্পরিক হত্যা, খুন ও অরাজকতার দ্বার উন্মোচিত হবে তখন তুমি তরবারি ভেঙে বাড়িতে এমনভাবে নির্জনে বসে থাকবে যেভাবে কোনো কক্ষে এর মেঝে পড়ে থাকে।'** এই আদেশ সম্ভবত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র জন্য অথবা কেবল সেই নৈরাজ্যের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল, নতুবা কোনো কোনো সময় অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যের মোকাবিলা বা প্রতিহত করাও একটি প্রকৃষ্ট ধর্মসেবার বৈশিষ্ট্য রাখে।

দ্বিতীয় সাহাবী ছিলেন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্‌ (রা.)। তিনিও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন ছিলেন এবং কুরাইশী ছিলেন। তার উচ্চ পদমর্যাদার বিষয়টি এর মাধ্যমেও প্রকাশ পায় যে, মহানবী (সা.) তাকে **'আমীনুল মিল্লাত'** উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.) যে দুইজন সাহাবীকে খিলাফতের যোগ্য মনে করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। আবু উবায়দা (রা.) হযরত উমর (রা.)-র যুগে প্লেগের মহামারিতে মৃত্যু বরণ করে শহীদ হন।

এরপর আরেকটি যুদ্ধাভিযান হলো **যায়েদ বিন হারেসার সারিয়্যা** যা বনু সুলায়েম (গোত্র) অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানী মাসে মহানবী (সা.) তাঁর মুক্তকৃত দাস যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র নেতৃত্বে কয়েকজন মুসলমানকে বনু সুলায়েম গোত্র অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই গোত্র তখন **নাজদ** অঞ্চলের **জামূম** নামক স্থানে বসবাস করত আর দীর্ঘকাল যাবৎ মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ বা লড়াই করে আসছিল। খন্দকের যুদ্ধেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই গোত্রের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যখন জামূমে পৌঁছেন, যা মদীনা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল, তখন তা জনমানবশূন্য দেখতে পান। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষী মুযায়না গোত্রের হালীমা নামের একজন নারীর মাধ্যমে তারা সেই স্থানের সন্ধান লাভ করেন যেখানে তখন বনু সুলায়েম গোত্রের একটি অংশ নিজেদের গবাদি পশুগুলোকে চরাচ্ছিল। কাজেই এই তথ্যকে পুঁজি করে যায়েদ বিন হারেসা (রা.) সেই স্থানে আক্রমণ করেন। এই অতর্কিত আক্রমণে বিচলিত হয়ে অধিকাংশ মানুষ দিগ্‌বিদিক পলায়ন করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, কিন্তু কয়েকজন বন্দি এবং গবাদি পশু মুসলমানদের হস্তগত হয়, যেগুলো নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে আসেন। ঘটনাচক্রে সেই বন্দিদের মাঝে হালীমার স্বামীও ছিল। তবে যদিও সে বিরোধী যোদ্ধা ছিল, যুদ্ধ করত, মহানবী (সা.) হালীমার সেই সাহায্য অর্থাৎ তথ্য সরবরাহ করার কারণে মুক্তিপণ ছাড়া শুধুমাত্র হালীমাকেই নয় বরং তার স্বামীকেও দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দেন এবং হালীমা ও তার স্বামী সানন্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

অনুরূপভাবে **যায়েদ বিন হারেসার যুদ্ধাভিযানের** উল্লেখ পাওয়া যায় যা **ঈস** অভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছিল। সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে এর বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে: মহানবী (সা.) ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে তাকে অর্থাৎ যায়েদ বিন হারেসাকে একশ সত্তরজন সাহাবীর নেতৃত্ব দিয়ে পুনরায় মদীনা থেকে প্রেরণ করেন। জীবনীকারগণ এ যুদ্ধাভিযানের কারণ বর্ণনা করে লিখেছেন, মক্কার কুরাইশের একটি দল সিরিয়া থেকে ফেরত আসছিল। তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য মহানবী (সা.) এ দলটিকে প্রেরণ করেছিলেন। কুরাইশের কাফেলাগুলো সর্বদা সশস্ত্র থাকত আর মক্কা ও সিরিয়ার মাঝে যাতায়াত করার সময় তারা একেবারে মদীনার কোল ঘেঁষে আসা-যাওয়া করত। এ কারণে তাদের পক্ষ থেকে সর্বদা বিপদের আশঙ্কা ছিল। এছাড়া এসব কাফেলা যেদিক দিয়েই যাতায়াত করত, আরবের গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিপক্ষে প্ররোচিত করতে থাকত। যে কারণে দেশজুড়ে মুসলমানদের বিপক্ষে শত্রুতার এক ভয়াবহ আগুন প্রজ্বলিত হয়েছিল। তাই এদেরকে প্রতিহত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) উক্ত কাফেলার সংবাদ পেয়ে যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে সেদিকে প্রেরণ করেন আর তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সাথে এমনভাবে অগ্রসর হন যে, ঈস নামক স্থানে গিয়ে সেই কাফেলাকে ধরে ফেলেন। ঈস একটি জায়গার নাম যা মদীনা থেকে চার দিনের দূরত্বে সমুদ্রের দিকে অবস্থিত। যেহেতু এটি অতর্কিত আক্রমণ ছিল তাই কাফেলার লোকেরা মুসলমানদের আক্রমণ সহ্য করতে পারে নি আর তারা তাদের জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। যায়েদ (রা.) কয়েকজন বন্দিকে আটক করেন এবং কাফেলার জিনিসপত্র নিজের করায়ত্তে নিয়ে মদীনার পথ ধরেন এবং মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন।

এসব ঘটনার মাঝে **আবুল আ'স বিন রবী'**র আটক হওয়া ও ইসলাম গ্রহণ করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিশদ বিবরণ হলো, ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে

আবুল আ'স বিন রবী' বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নিজের পণ্য এবং কুরাইশের লোকদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বাণিজ্য শেষে সে যখন কাফেলা নিয়ে ফেরত আসছিল তখন মহানবী (সা.)-এর একটি সৈন্যদলের সাথে তারা মুখোমুখি হয়। সাহাবীরা তাদের কাছে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে নেয় এবং কাফেলার লোকদের বন্দি করেন। ইবনে সা'দ লেখেন, হযরত যায়েদ (রা.) এই কাফেলাকে, যাদের মধ্যে আবুল আ'সও ছিল, আটক করেন এবং তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন। ইমাম যুহরী ও ইবনে উকবার মতে আবু বসীর, আবু জান্দাল এবং তাদের উভয়ের সঙ্গীরা আবুল আ'স-এর এই কাফেলার নিকট থেকে মালপত্র জব্দ করেন এবং তাদেরকে বন্দি করেন। তাদের গন্তব্যস্থল ছিল সীফুল বাহর। সীফুল বাহর-এর উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে, এটি ঈস-এর নিকটস্থ সমুদ্র তীরবর্তী স্থান ছিল। তারা উভয়ে এ কাফেলার কাউকেই হত্যা করেন নি, কেননা মহানবী (সা.)-এর সাথে আবুল আ'স-এর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়তা ছিল; তিনি মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আবুল আ'স অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের হাত থেকে, অর্থাৎ যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র সৈন্যদের হাত থেকে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা যখন এই কাফেলার ধনসম্পদ নিয়ে ফেরত আসে তখন আবুল আ'স রাতের বেলা মদীনায় আসে আর নিজের স্ত্রী রসূল-তনয়া হযরত যয়নব (রা.)-র নিকট গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে। হযরত যয়নব (রা.) আবুল আ'সকে আশ্রয় প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যখন ফজরের নামায পড়ান তখন তিনি (সা.) তকবীর পাঠ করেন আর মানুষজনও তাঁর (সা.) সাথে তকবীর বলেন। হযরত যয়নব (রা.) তখন **সুফফাতুন নিসা**, অর্থাৎ নারীদের জন্য নির্ধারিত যে স্থান ছিল সেখান থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলেন; [আর অপর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি নিজের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন,] হে লোকেরা! আমি আবুল আ'সকে আশ্রয় প্রদান করেছি। মহানবী (সা.) যখন সালাম ফেরান তখন তিনি (সা.) উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, হে লোকসকল! তোমরা কি তা শুনেছো যা আমিও শুনেছি? তারা নিবেদন করেন, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ রয়েছে, আমি এই বিষয়ের কিছুই আমি জানতাম না। এ সম্পর্কে আমার পূর্বে জানা ছিল না। এখনই (হযরত) যয়নবের কাছ থেকে শুনেছি। এমনকি আমি তা শুনেছি যা তোমরাও শুনেছ। মুসলমানরা তাদের শত্রুর বিপক্ষে একজোট। তিনি (সা.) বলেন, মুসলমানরা তাদের শত্রুর বিপক্ষে একজোট। তাদের নগণ্য ব্যক্তিও (কাউকে) আশ্রয় দিতে পারে। আরেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলেন, আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি যাকে যয়নব আশ্রয় দিয়েছে। এরপর মহানবী (সা.) নিজ গৃহে প্রবেশ করলে হযরত যয়নবও মহানবী (সা.)-এর সাথে প্রবেশ করেন আর আবুল আ'স-এর কাছ থেকে যা কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেবার দাবি করেন। তিনি (সা.) দাবি মেনে নেন এবং বলেন, হে আমার কন্যা! তাকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করো, কিন্তু সে যেনো তোমার সাথে একান্তে মিলিত না হয়। নিঃসন্দেহে তুমি তার জন্য বৈধ নও, কেননা সে কাফির এবং তুমি মুসলমান। মহানবী (সা.) এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। অর্থাৎ যারা আবুল আ'স-এর কাছ থেকে মালপত্র নিয়েছিলেন, তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, এই ব্যক্তি আমার (পরিবারের) অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি তোমরা জানো। অর্থাৎ তার সাথে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আর তোমরা তার কাছ থেকে মালপত্র ছিনিয়ে নিয়েছ। যদি তোমরা অনুগ্রহ করো আর তার মালপত্র তাকে ফিরিয়ে দাও; [তিনি (সা.) নির্দেশ দেন নি, (বরং) তিনি বলেন,] যদি তোমরা অনুগ্রহ করে তার মালপত্র তাকে ফিরিয়ে দাও তাহলে তা আমার ভালো লাগবে।

আর যদি তোমরা অস্বীকার করো তাহলে এটি আল্লাহ্ তা'লার গনিমত, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই আর তোমরাই এর অধিক অধিকার রাখো। তখন তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা এই মালপত্র তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। ইবনে উকবা লিখেছেন, আবুল আ'স হযরত যয়নব (রা.)-র সাথে নিজের সেসব সঙ্গীর বিষয়ে কথা বলে যাদেরকে আবু বসীর এবং আবু জান্দাল বন্দি করেছিলেন আর তাদের কাছ থেকে মালপত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত যয়নব আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন। মহানবী (সা.) আগমন করেন আর লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি কয়েকজনকে জামাতা বানিয়েছি। আর আমি আবুল আ'সকেও জামাতা বানিয়েছি এবং তাকে আমি উত্তম জামাতা হিসেবে পেয়েছি। সে সিরিয়া থেকে নিজের কয়েকজন কুরাইশ সঙ্গীর সাথে ফিরে আসছিল। আবু জান্দাল এবং আবু বসীর তাদেরকে আটক করে আর তাদেরকে বন্দি করেছে। আর তাদের কাছে যা কিছু ছিল তা কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকেও হত্যা করে নি। আর যয়নব আমার কাছে অনুরোধ করেছে, আমি যেন তাকে আশ্রয় দেই। তোমরা কি আবুল আ'স এবং তার সঙ্গীদের আশ্রয় দেবে? তখন লোকেরা বলে, জি হ্যাঁ। যখন আবুল আ'স এবং তার বন্দি সঙ্গীদের ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর এই কথা আবু জান্দাল ও তার সঙ্গীদের কানে পৌঁছে তখন তারা সবাইকে মুক্ত করে দেন আর সকল জিনিসপত্র তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন, এমনকি রশিও ফেরত দেন। ইবনে ইসহাক এবং মুহাম্মদ বিন উমর-এর মতে সাহাবীরা তাদের সবকিছু ফিরিয়ে দেন। এমনকি কেউ বালতি নিয়ে আসে, কেউ মশক এবং কেউ বদনা নিয়ে আসে, কেউবা হাওদার কাঠ নিয়ে আসে। তারা বন্দিসহ সবকিছুই ফিরিয়ে দেন আর এর মধ্য থেকে কোনো জিনিসই হারায় নি। এরপর আবুল আ'স মালপত্র নিয়ে মক্কা অভিমুখে চলে যায় আর প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেয়। এরপর দণ্ডায়মান হয়ে বলে, অর্থাৎ আবুল আ'স মক্কাবাসীদের সামনে বলে, হে মক্কাবাসী! তোমাদের মধ্য থেকে কোনো এক ব্যক্তিরও কোনো সম্পদ কি আমার কাছে বাকি আছে যা সে ফেরত নেয় নি? হে মক্কাবাসীরা! আমি কি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি? তখন তারা সবাই বলে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন; আমরা তোমাকে অতি উত্তম এবং বিশ্বস্ত পেয়েছি। তখন আবুল আ'স ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়ে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.)-এর কাছে (থাকা অবস্থায়) কোনো কিছুই আমাকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে আটকাতে পারতো না। অর্থাৎ আমি যখন মদীনায় ছিলাম সেখানেও ইসলাম গ্রহণ করতে পারতাম; কিন্তু আমার ভয় হয়, পাছে তোমরা হয়ত ভাববে, আমি তোমাদের ধনসম্পদ গ্রাস করার পাঁয়তারা করছি। আল্লাহ্ তা'লা যখন এই ধনসম্পদ তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন; [যে আমানত ছিল তা আমি তোমাদের ফিরিয়ে দেই এবং আমি এগুলোর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই] তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি। অতঃপর (তিনি) সেখান থেকে যাত্রা করেন এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে মদীনায় চলে আসেন।

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন,

ঈস-এর অভিযানে (আটককৃত) বন্দিদের মাঝে আবুল আ'স বিন রবী'ও ছিলেন যিনি মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন এবং প্রয়াত হযরত খাদীজা (রা.)-র একজন নিকটাত্মীয় ছিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি বদরের যুদ্ধেও বন্দি হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সে সময় মহানবী (সা.) এ শর্তে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি মক্কায় ফিরে গিয়ে তাঁর (সা.) কন্যা রসূল-তনয়া হযরত

যয়নব (রা.)-কে মদীনায় পাঠিয়ে দেবেন। আবুল আ'স এ অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিল বটে, কিন্তু সে নিজে তখনো শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিল। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) যখন তাকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসেন তখন রাত ছিল, কিন্তু কোনোভাবে আবুল আ'স হযরত যয়নব (রা.)-কে সংবাদ পাঠায় যে, আমি এভাবে বন্দি হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি, তুমি যদি আমার জন্য কিছু করতে পারো তবে করো। অতএব যখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা ফজরের নামাযে ব্যস্ত ছিলেন ঠিক সেই সময় যয়নব (রা.) বাড়ির ভেতর থেকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলেন, হে মুসলমানেরা! আমি আবুল আ'স-কে আশ্রয় দিয়েছি। মহানবী (সা.)-এর নামায পড়া শেষ হলে সাহাবীদের দিকে ফিরে বলেন, যয়নব যা বলেছে তা কি আপনারা শুনেছেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না, কিন্তু মুমিনদের জামা'ত এক আত্মার মতো বা এক দেহের বৈশিষ্ট্য রাখে। তাদের মধ্য হতে কেউ যদি কোনো কাফিরকে আশ্রয় প্রদান করে তবে তার সম্মান করা আবশ্যক। অতঃপর তিনি (সা.) যয়নবের দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি। আর এই অভিযানে আবুল আ'স-এর কাছ থেকে যে ধনসম্পদ হস্তগত হয়েছিল তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি (সা.) বাড়ি আসেন এবং নিজের কন্যা যয়নব (রা.)-কে বলেন, ভালোভাবে আবুল আ'স-এর আদর-আপ্যায়ন করো, কিন্তু তার সাথে নিভৃতে মিলিত হয়ো না, কেননা এহেন অবস্থায় তার সাথে তোমার মিলিত হওয়া বৈধ নয়। কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করে আবুল আ'স মক্কা অভিমুখে ফেরত চলে যায়, কিন্তু তার এবারকার মক্কায় যাওয়া সেখানে অবস্থানের উদ্দেশ্যে ছিল না, কেননা তিনি অতি শীঘ্রই নিজের দেনাপাওনা মিটিয়ে কলেমা শাহাদত পড়তে পড়তে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। এরপর তিনি (সা.) হযরত যয়নব (রা.)-কে পুনরায় কোনো বিয়ে ছাড়াই তার কাছে ফেরত পাঠান। অর্থাৎ এ পর্যায়ে তাকে অনুমতি দিয়ে দেন যে, তিনি স্ত্রী হিসেবে (তার সাথে) থাকতে পারেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে, সে সময় হযরত যয়নব (রা.) এবং আবুল আ'স-এর পুনরায় বিয়ে পড়ানো হয়েছিল, কিন্তু প্রথম রেওয়ায়েত অধিক নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক।

হযরত আবুল আ'স (রা.)-র ব্যাবসাবাণিজ্য মক্কায় ছিল, এজন্য তিনি মদীনায় অবস্থান করতে পারতেন না। কাজেই ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় অবস্থানের কারণে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, কেবল দশম হিজরীতে হযরত আলী (রা.)-র নেতৃত্বে প্রেরিত একটি যুদ্ধাভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) ইয়েমেন থেকে ফেরত আসার সময় তাকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। অষ্টম হিজরীতে হযরত যয়নব (রা.)-র ইন্তেকালের পর আবুল আ'স (রা.)-ও আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না এবং দ্বাদশ হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

এরপর একটি যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায় যেটিকে বনু লাহইয়ান-এর যুদ্ধ বলা হয়। এর নাম লিহইয়ান এবং লাহইয়ান দুভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বনু লাহইয়ান ছিল বনু হুযাইল গোত্রের একটি শাখা। মক্কা থেকে তিন মারহালা দূরত্বে আসফান উপত্যকা ছিল যার উত্তর-পূর্বদিকে পাঁচ মাইল দূরত্বে অবস্থিত গুরান উপত্যকায় বনু লাহইয়ান বসবাস করতো। বনু লাহইয়ান-এর যুদ্ধ সম্পর্কে এই মতভেদ রয়েছে যে, এটি কোন সালে এবং কোন মাসে সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে সা'দ-এর মতে, এই যুদ্ধাভিযান ষষ্ঠ হিজরী সনের রবিউল

আউয়াল মাসের একেবারে প্রারম্ভে সংঘটিত হয়েছে। মুহাম্মদ বিন উমরের মতে ষষ্ঠ হিজরী সনের রজব মাসে এবং আল্লামা ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধাভিযান বনু কুরায়যার যুদ্ধের ছয় মাস পরে ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা হাকেম এটিকে শাবান মাসের যুদ্ধাভিযান লিখেছেন। আল্লামা ইবনে হাযম এটিকে পঞ্চম হিজরী সনের, আল্লামা যাহবী ষষ্ঠ হিজরী সনের এবং কতক জীবনীকার এটিকে চতুর্থ হিজরী সনের যুদ্ধাভিযান লিখেছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তদনুসারে তিনি এটিকে ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসের যুদ্ধ লিখেছেন। তিনি লেখেন,

বনু লাহইয়ানের যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনে সা'দ এটিকে ষষ্ঠ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইবনে ইসহাক এবং তাবারী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, আমি এ স্থলে ইবনে ইসহাকের অনুসরণ করেছি, অর্থাৎ তাঁর মতে তিনি সঠিক। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

বনু লাহইয়ানের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব রাজী-র সাহাবীদের মর্মান্তিক ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন:

সেই ঘটনায় দশজন নিষ্পাপ মুসলমানকে, যাদেরকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচারের কাজে প্রেরণ করা হয়েছিল, অত্যন্ত নির্দয়ভাবে এবং প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল আর এই পুরো ষড়যন্ত্রের মূলে বনু লাহইয়ানের হাত ছিল, যারা সেই যুগে মক্কা এবং মদীনার মাঝখানে গুরান উপত্যকায় বসবাস করত। স্বভাবতই মহানবী (সা.) এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। আর যেহেতু বনু লাহইয়ানের আচরণ তখনও একইরকম শত্রুতামূলক এবং ষড়যন্ত্রমূলক ছিল আর তাদের পক্ষ থেকে আগামীতেও এই আশঙ্কা ছিল যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন কোনো উস্কানির কারণ হতে পারে, তাই তিনি (সা.) কৌশলগত দিক থেকে তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা সমীচীন মনে করেছেন যেন অন্ততপক্ষে ভবিষ্যতের জন্য মুসলমানরা তাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

এজন্য মহানবী (সা.) এই সতর্কতামূলক অভিযানের জন্য স্বয়ং রওয়ানা হন আর ইবনে মাকতুম (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) তাঁর সাথে দুইশত সাহাবী এবং বিশটি ঘোড়া নিয়ে মদীনার উত্তর দিকে সিরিয়ার পথ ধরে যাত্রা করেন, অথচ বনু লাহইয়ান মদীনার দক্ষিণ দিকে হেজাযে মক্কার পথের নিকটে বসবাস করত। উত্তর দিকে যাবার কারণ ছিল, তিনি (সা.) বনু লাহইয়ানের ওপর তাদের অজ্ঞাতসারে অতর্কিত আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন, যেন তারা আক্রমণের সংবাদ পেয়ে কোথাও পালিয়ে না যায়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি (সা.) এমন রাস্তা ব্যবহার করেন যা সচরাচর ব্যবহার করা হতো না, আর দ্রুততার সাথে সফর করে বনু লাহইয়ানের বসতি গুরান-এ পৌঁছে যান, যেখানে তাঁর (সা.) সাহাবীরা শহীদ হয়েছিলেন। তিনি (সা.) তাঁর শহীদ সাহাবীদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। বনু লাহইয়ান যখন তাঁর (সা.) আগমনের কথা জানতে পারে তখন তারা পাহাড়ের চূড়ায় পালিয়ে যায়। তাই তাদের কেউই ধরা পড়ে নি। তিনি (সা.) একদিন অথবা দুই দিন সেখানে অবস্থান করেন আর সকল দিকে সেনাদল প্রেরণ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ ধরা পড়ে নি। তিনি (সা.) গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন আর এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, এই সফরে তিনি (সা.) যখন সেই স্থানে পৌঁছেন যেখানে তাঁর (সা.)

সাহাবীদেরকে শহীদ করা হয়েছিল তখন তিনি (সা.) ভীষণ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং পরম অনুনয়-বিনয়ের সাথে সেই সমস্ত শহীদের জন্য দোয়া করেন।

তিনি (রা.) আরো লেখেন, যখন বনু লাহইয়ানের ওপর অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা তাদের পাহাড়ের চূড়ায় পালিয়ে যাবার কারণে সফল হলো না, তখন তিনি (সা.) উসফান পর্যন্ত যান যেন মক্কাবাসীরা মনে করে যে, তিনি (সা.) মক্কায় যাবেন। অতএব তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে উসফান গিয়ে পৌঁছেন। ইবনে ইসহাকের মতে এরপর তিনি (সা.) দুইজন অশ্বারোহী প্রেরণ করেন আর ইবনে সা'দের মতে তিনি (সা.) হযরত আবু বকরকে দশজন অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন যেন কুরাইশ তাদের সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের বিষয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়। হযরত আবু বকর (রা.) **কুরাউল গামীম** পর্যন্ত যান, যেটি উসফান থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) (পুনরায়) উসফান ফেরত আসেন, আর কারো সাথে তাদের মোকাবিলা হয় নি। অতঃপর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মদীনায় ফিরতি যাত্রা আরম্ভ করেন আর চৌদ্দ দিন বাইরে অবস্থানের পর ফেরত আসেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, ফিরতি যাত্রার সময় তিনি (সা.) একটি দোয়া করেন যা পরবর্তীতে মুসলমানরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সাধারণত পাঠ করত আর সেই দোয়াটি হলো, اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ অর্থাৎ, **আমরা আমাদের খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁরই সমীপে বিনত হই, তাঁরই ইবাদতকারী, তাঁরই দরবারে সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর গুণকীর্তনকারী।**

মহানবী (সা.) নিজেও তাঁর পরবর্তী সফরগুলোতে সাধারণত এ দোয়া পাঠ করতেন আর কখনো কখনো এর সাথে এই শব্দাবলি যুক্ত করতেন– صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ। অর্থাৎ **আমাদের খোদা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন আর শত্রুদলকে স্বয়ং নিজ শক্তিবলে পশ্চাৎপদ করেছেন।**

এই দোয়া, যা বনু লাহইয়ানের যুদ্ধাভিযানের বরাতে জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন আর হাদীস বিশারদগণও যার সত্যায়ন করেছেন, নিজের মাঝে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আর এটি পাঠের মাধ্যমে সেই আবেগ-অনুভূতির বিষয়টি অনুমান করার সুযোগ লাভ হয় যা সেই অরাজকতাপূর্ণ যুগে মহানবী (সা.)-এর, (যাঁর জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত,) তাঁর পবিত্র হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল এবং যা মহানবী (সা.) স্বীয় সাহাবীদের হৃদয়ে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এ দোয়ায় এই ব্যাকুলতা সুপ্ত রয়েছে যে, শত্রুদের পক্ষ থেকে যে প্রতিবন্ধকতা মুসলমানদের ইবাদতবন্দেগী এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ তবলীগের পথে সৃষ্টি করা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা তা দূর করুন; আর আল্লাহ্ তা'লা সেই প্রতিবন্ধকতা যতটুকু দূর করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এরূপ যেভাবে এক ব্যক্তি তার খুব পছন্দের কোনো কাজে মগ্ন থাকে আর হঠাৎ অন্য কোনো ব্যক্তি তার কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়, কিন্তু কিছু সময় পর খোদার কৃপায় এ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায় আর সেই ব্যক্তি পুনরায় তার পছন্দনীয় কাজে মগ্ন হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এহেন পরিস্থিতিতে যে আবেগ সেই ব্যক্তির হৃদয়ে সৃষ্টি হবে তা-ই এ দোয়ায় সুপ্ত রয়েছে, কেননা মহানবী (সা.) বলেন, আমরা এ সফরের সাময়িক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় সেই পরিস্থিতির দিকে ফেরত আসছি যাতে আমরা আমাদের খোদার স্মরণে সময় অতিবাহিত করতে পারব এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার সুযোগ লাভ করব। হ্যাঁ, সেই খোদা,

যিনি এর পূর্বেও অসংখ্য বার আমাদেরকে শত্রুর নৈরাজ্য থেকে সুরক্ষিত করে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এই অনুভূতি কতই না কল্যাণমণ্ডিত আর কতই না মনোমুগ্ধকর আর কতই না শান্তিপূর্ণ! কিন্তু হায় পরিতাপ! এতৎসত্ত্বেও কতিপয় ইসলামবিদ্বেষী আপত্তি উত্থাপন করা থেকে বিরত হয় না আর এটিই বলতে থাকে যে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আগ্রাসী সেনা অভিযান এবং পার্থিব লালসা (নাঊযুবিল্লাহ্)।

এরপর আরো একটি অভিযান তথা যায়েদ বিন হারেসার অভিযান রয়েছে। এই অভিযান ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে বনু সালাবা বিন সা'দ গোত্র অভিমুখে তারেফ নামক স্থানে প্রেরণ করেন। তারেফ বনু সালাবার একটি কূপের নাম যা ইরাক যাবার পথে মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) পনেরোজন লোকসহ বের হন আর যখন তারেফ পৌঁছেন তখন সেখানকার উট এবং বকরিগুলো হস্তগত করেন। তখন সেখানে উপস্থিত বেদুইনরা এই ভেবে ভয় পায় যে, মহানবী (সা.) তাদের দিকে আসছেন আর তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) গবাদিপশুগুলো হাঁকিয়ে মদীনা নিয়ে আসেন। বনু সালাবার লোকেরা সেসব সাহাবীর খোঁজে বের হয়, কিন্তু তারা সাহাবীদের নাগাল পায় নি। সাহাবীরা মোট বিশটি উট নিয়ে আসেন। তারা এই অভিযানের জন্য চার রাত (মদীনার) বাহিরে ছিলেন, কিন্তু কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। এই অভিযানে মুসলমানদের রণসংগীত ছিল- আমেত, আমেত। বাকি পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে কমবেশি সবাই জানে। সিরিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতি এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও বলা হচ্ছে, এক অত্যাচারী স্বৈরশাসকের পতন হয়েছে, কিন্তু দোয়া করুন যেন ভবিষ্যতে আগমনকারী সরকার ন্যায়পরায়ণ হয়। যারা ক্ষমতায় আসে তারা সবাই দাবি করে, আমরা ন্যায়বিচার করব; কিন্তু সাধারণত এটিই দেখা গেছে যে, যখন ক্ষমতা লাভ হয় তখন তাদের কথার সাথে কাজের মিল থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা এই এলাকার আহমদীদের নিজ সুরক্ষায় রাখুন। বিশ্লেষকরা লিখেছেন, অত্যাচার শেষ হওয়ায় বাহ্যত মানুষ আনন্দ উদ্‌যাপন করছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে– তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এছাড়া বিনা কারণে ইসরাঈলও এসব এলাকায় আক্রমণ করছে। বাহ্যত মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরুদ্ধে তাদের উদ্দেশ্য ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশই নিরাপদ নয়। এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জন্যও দোয়া করুন, ইরানসহ অন্যান্য দেশের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিবেক ও চেতনাবোধ দান করুন। আর তাদের মাঝে থাকা দলাদলি ও ক্ষমতা লাভের লালসা যেন দূর হয়ে যায় আর তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে এমন আচরণ অব্যাহত থাকে তাহলে এমন অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সাহায্য করবেন যারা নিজেদের লোকদেরকেই হত্যা করছে? যাহোক, অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে তাদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। আহমদীরা এসব নামসর্বস্ব মুসলমানের হাতেও নিরাপদ নয়, আর মুসলিম-বিরোধী অমুসলিমদের হাতেও নিরাপদ নয়। আল্লাহ্ তা'লা দয়া করুন এবং আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে স্বীয় নিরাপত্তায় সুরক্ষিত রাখুন।

একইসাথে সাম্প্রতিক সময়ে পৃথিবীতে অসংখ্য ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে মায়োটে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। সেখানেও আহমদীরা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তারা নিরাপদে আছেন। আর জামা'তও সেখানে সেবা করছে আর সেখানকার সরকারও এসব

কাজের প্রশংসা করেছে। আর যেখানে লোকেরা খাবার চড়া দামে বিক্রি করছে, ক্ষুধার্তরা খাবার পাচ্ছে না, সেখানে জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেবাদান করছে এবং খাবার খাওয়াচ্ছে। কিন্তু যাহোক, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা এসব উপদ্বীপকে ঐশী বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত রাখেন।

এছাড়া আমি নামাযের পর জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা শহীদ আমীর হাসান ওরানী সাহেবের। তিনি মীরপুর জেলার নুসরাতাবাদের দুররে মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাকে শহীদ করা হয়েছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি মসজিদ থেকে ঘরে ফিরছিলেন, পথিমধ্যে তাকে গুলি করে শহীদ করা হয়। মরহুম ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার মা, সহধর্মিণী, দুই ছেলে ও তিন কন্যা রয়েছে। ভাই বোনও আছে। ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা হলো, আমীর হাসান সাহেব ১৩ ডিসেম্বর তারিখ ভোরে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায বাজামা'ত আদায়ের পর নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। তার বারো বছর বয়সী পুত্র স্নেহের তৈমুরও তার সাথে ছিল। তার বাড়ি এবং মসজিদের মাঝে একটি সড়ক রয়েছে। তারা সড়ক অতিক্রম করা মাত্রই দুইজন অজ্ঞাতনামা মোটর সাইকেল আরোহী, যারা পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলো, নিজেদের চেহারা ঢেকে তার নিকটে এসে নাম জিজ্ঞেস করে, আর শনাক্ত করার পর গুলি করে। শহীদ মরহুমের দেহে পাঁচটি গুলি লাগে যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এরপর আক্রমণকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তার পুত্র স্নেহের তৈমুরকে আল্লাহ্ তা'লা অলৌকিকভাবে নিরাপদ রেখেছেন। এরপর তার পুত্র অসাধারণ সাহস ও অবিচলতার পরিচয় দিয়ে জামা'তের সদস্যদের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে।

মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ মুকাররম ধনি বখশ সাহবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বয়আত গ্রহণ করেন। শহীদ মরহুমের দাদা আহমদী ছিলেন না। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যরা, অর্থাৎ চাচারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল। শহীদ মরহুমের পিতা দুররে মুহাম্মদ সাহেব দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে ১৯৬৪ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন মুকাররম সৈয়্যদ দাঊদ মুজাফফর শাহ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি সেই দিনগুলোতে সেখানে ছিলেন এবং কৃষিকাজ করতেন। শহীদ (মরহুম) কৃষিকাজ করতেন আর কিছুদিন যাবৎ নুসরতাবাদে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবেও ডিউটি দিচ্ছিলেন। মরহুম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং শাহাদাতের সময় সেক্রেটারি ওয়াকফে নও হিসেবে সেবা করছিলেন। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার গভীর সম্পর্ক ছিল তার। অতিথিপরায়ণ ছিলেন, নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তার মা বলেন, আমাদের জন্য এটি অনেক বড়ো সৌভাগ্য যে, আমার পুত্র শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। জামা'তের জন্য আমার অন্য পুত্রের কুরবানি দিতে হলেও আমি প্রস্তুত আছি। অত্যন্ত সাহসী এক মা তিনি। তার পিতার মৃত্যুর পর সব সময় ভাইবোনদের খেয়াল রাখতেন। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। প্রতিবেশীদের মাঝে অ-আহমদী এক অন্ধ মহিলা ছিল। তার ছাগপালের এবং তার সন্তানদের দেখাশোনা করতেন। তার সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যেতেন। বাজামা'ত নামাযে খুবই নিয়মিত ছিলেন।

মীরপুরখাস জেলার আমীর সাহেব লেখেন, প্রত্যেক জামা'তী অনুষ্ঠানের জন্য সব কাজ ফেলে ডিউটিতে উপস্থিত হয়ে যেতেন। গত একমাস যাবৎ মরহুমের মাঝে আমি স্পষ্ট

পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি যে, ফজরের পূর্বে এসে মসজিদ খোলা, নফল আদায় করা দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। এমন মনে হতো যেন এক নতুন আমীর হাসান জন্ম নিয়েছে।

তার আত্মীয় জামেয়ার শিক্ষক খালেদ বেলুচ লেখেন, তার গুণাবলির মাঝে সাহসিকতা ও অন্যদের উপকারে আসার গুণ অনেক বেশি ছিল। যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হতো সর্বদা আধ্যাত্মিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতেন। অধিকাংশ সময় খোদা এবং বান্দার সম্পর্ক কীভাবে উন্নত করা যায় সেই বিষয়ে কথা বলতেন।

আরেকজন মুরব্বী সাহেব লিখেন, আমাদের এলাকায় অ-আহমদীদের সাথেও তাঁর বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। তার মৃত্যুতে দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা শোক প্রকাশ করার জন্য আসে এবং সবারই এই বক্তব্য ছিল যে, তিনি সবার সাথে ভালোবাসা রাখে এমন ব্যক্তি ছিলেন, প্রত্যেকের বিপদের সাথি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদের নিজ নিরাপত্তায় রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা মালয়েশিয়া জামা'তের মুবাল্লেগ মুকাররম মওলানা আব্দুস সাত্তার রউফ সাহেবের। তিনিও কিছুদিন পূর্বে পঁচাত্তর বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৩ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন; মুবাশ্বের কোর্স সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন দেশে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৫ সালে মুবাল্লেগ হিসেবে ইন্দোনেশিয়ায় তার পদায়ন হয়। এরপর তাকে ফিজিতে পাঠানো হয়। সেখানে কয়েক বছর ছিলেন। এরপর তিনি ইন্দোনেশিয়ায় চলে যান। অতঃপর তাকে মালয়েশিয়া পাঠানো হয়, সেখানে তবলীগ করেন। এরপর ভিয়েতনামে তার নিযুক্তি হয়, সেখানেও কয়েক বছর অবস্থান করেন। তারপর পুনরায় তিনি মালয়েশিয়া সেবা করার সৌভাগ্য পান। খুবই উত্তম সেবক ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী, তিন পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। তার পরিচিত ব্যক্তিরা লিখেছেন যে, মরহুম জামা'তের জন্য পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গিত ছিলেন আর জামা'তের সদস্যদেরকেও কুরবানী এবং ওয়াকফের বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং সবার দুর্বলতা ঢেকে রাখতেন। তার তবলীগি চেষ্টা প্রচেষ্টায় বহু লোক জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য পেয়েছে। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। যখনই মহানবী (সা.)-এর উল্লেখ করা হতো তার চোখে অশ্রু নেমে আসতো। ভিন্ন দেশে গিয়ে জামা'তের সেবা করার কথা বললে নিজ স্ত্রী-সন্তানকে পিছনে রেখে কোনো চিন্তা ছাড়াই চলে যেতেন। আর সর্বদা জামা'তের খাতিরে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, মরহুমের সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)